আয় বৃষ্টি

তপনকুমার দাস

সূচিপত্র

অরণ্যের কলি	৯
সতেরোই ফেব্রুয়ারি	১৭
হৃদয়ের কাছে	২৮
বেলা অবেলার খেলা	৩৭
বৃষ্টি ভেজা জীবন	৪৫
চেতন অবচেতন	৫৩
জপমালা	৬৩
মেঘ জোছনা	৭৪
আনন্দ অনাবিল	৮৫
ইচ্ছের ঘোড়া	৯৪
বনবাস	১০২
ভানুমতীর খেল	১১২
আয় বৃষ্টি	১২০

অরণ্যের কলি

আজও কোনও খবর নেই কলির।

মোবাইল সুইচড্ অফ। দুপুরে অফিসে ফোন করেছিল অরণ্য। একরাশ বিরক্ত ঝরানো উত্তর শুনিয়েছিল অনু। অনুর বিরক্তি অস্বাভাবিক নয়। কলি না আসলে কাউন্টারের যাবতীয় কাজ তো তাকেই সামলাতে হয়। আজ শুক্রবার। গত সোমবার থেকে কলির কোনও পাত্তা নেই। না মোবাইলে, না অফিসের ফোনে।

শ্বেতাকে একবার ফোন করলে কেমন হয়। মনে মনে ভাবে অরণ্য। মোবাইলটা তালুর ওপর রেখে খুঁজতে থাকে শ্বেতাকে। কলিদের পাড়ার বউ শ্বেতার সঙ্গে অনেকদিন আগে পরিচয় হয়েছিল অরণ্যের। তখনই জেনেছিল, সুখে না হোক, অসুখ-বিসুখ দুঃখ-দৈন্যে ওরা একে অপরের পরিপূরক। কলি চাকরি করে। সংসার মানে একমাত্র ছেলেকে স্কুলে পাঠানো। টুকটাক রান্না করা। ঘর গোছানো। স্বামীর চাকরি চেন্নাইয়ে। বছরে মাত্র দু'বার বাড়িতে আসে। দুটো স্পেলে পনেরো পনেরো ত্রিশ দিনের ছুটিতে। ছেলের স্কুলের ছুটির সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে।

শ্বেতার মুখেই রজতের নাম শুনেছিল অরণ্য। কলিও দু-একবার গল্প বলেছে রজতের। গল্প বলতে বলতে আনমনা হয়েছে। হারিয়ে গেছে নিজের ভিতর। একবার তো বলেই ফেলেছিল অরণ্য—আমার চেয়েও রজতকে তুমি বেশি পছন্দ করো। শুনেই ফুঁসে উঠেছিল কলি, কী বললে?

না মানে, কলির সেই ভয়ঙ্কর মুখের ক্যানভাস দেখে ভয় পেয়েছিল অরণ্য। মেয়েদের চরিত্র বড়ো জটিল। সেই জটিলতা আরও ভয়ঙ্কর হয় যখন ওরা রেগে যায়। আহত হয়। আঘাত পায়।

হ্যাঁ, আমি রজতকে ভীষণ পছন্দ করি। একজন বোন তার একমাত্র দাদাকে যেমন পছন্দ করে ঠিক তেমনই, ফনা গুটিয়ে শুনিয়েছিল কলি। তারপর শুনিয়েছিল কমলের গল্প। কমল আর কলির গলাগলি ছবি দেখে শ্বেতার চমকে ওঠার গল্প। কমল আর কলির ছবি দেখে রজতের হতবাক হওয়ার গল্প। শুনিয়েছিল রজতের কমল হয়ে ওঠার চেষ্টার গল্প। আর সেইসব গল্প শুনতে শুনতে অদেখা অপরিচিত শ্বেতার স্বামী রজতের জন্য অরণ্যের মনের ভিতর শ্রদ্ধার ভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছিল কানায় কানায়।

একবার রজত আর কমলের ছবি দেখিয়েছিল কলি। অরণ্যের কাছে অপরিচিত দুই যুবক। যেন একে অপরের ক্লোন। কলির অকাল প্রয়াত দাদা কমলের হুবহু জেরক্স

কপি রজত। সুতরাং রজতের প্রতি কলির দুর্বলতা অস্বাভাবিক নয়। সেই দুর্বলতা আরও প্রশ্রয় দিয়েছে শ্বেতা। শ্বেতা বলে, কলি আমার রায়বাঘিনী ননদিনী। শ্বেতার ছেলে বুম্বা তো পিসিমণি বলতে পাগল। বুধবার পিসিমণির পাঠানো চিলি চিকেন কিংবা মটন কারি ছাড়া ভাতই ওঠে না বুম্বার মুখে। বুধবার বুম্বা টিউশন পড়তে যায় তালতলায়। কলির অফিসের পাশে। অফিস ছুটির পর বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকে কলি। বুম্বাকে নিয়ে শ্বেতার হাতে সঁপে তবেই নিজের ফ্ল্যাটে ঢোকে।

শ্বেতাকে নয়। শ্বেতার নম্বর খুঁজতে খুঁজতেই আবার কলিকে রিং করে ফেলে অরণ্য। না, হয় সুইচড অফ অথবা পরিসেবা সীমার বাইরে। মেজাজটা খিঁচড়ে একেবারে খিঁচুড়ি হয়ে যায়। আর ঠিক তখনই বাম্পের ওপর গাড়ির গতি কমাতে ব্রেক কষে মোহন দাস। সঙ্গে সঙ্গে মেজাজের যাবতীয় বারুদ অরণ্যের মুখের বাইরে ছুটে আসে। পিছনের সিটে বসেই তেড়ে ফুঁড়ে যেন মারতে যায় মোহনকে—এটা কি গাড়ি চালানো হচ্ছে? বুঝতে পারিনি স্যার—ভুল স্বীকার করতে দেরি করে না মোহন, বাম্পটা আসলে খেয়াল করিনি।

আরও অনেক কিছু বলার ছিল। বকুনি দেওয়ার ইচ্ছে ছিল মোহনকে। কিন্তু সেই ইচ্ছেয় বাদ সাধে মোবাইলের রিং। বিলায়েত খানের সেতারে তিলোক কামোদ রাগ। সঙ্গে দপদপানো আলোর ঝলক। রিংটোন আর আলোর ঝালর একসঙ্গে হঠাৎ হাজার হাজার হাতুড়ি পেটাতে শুরু করে অরণ্যের বুকের ভিতর। মোবাইল ধরা হাতের তালুটা যেন অসাড় হয়ে যায়। অচেনা নম্বর। নামহীন। তবুও মনে হয়, এ নিশ্চয়ই কলি। হয়তো শ্বেতার মোবাইল থেকে রিং করেছে কিংবা বুম্বার।

হ্যালো, কানের পাশে ফোন পৌঁছানোর আগেই ডিসকানেক্ট হয়ে যায়। মিসড কল তালিকায় উঠে যায় নম্বরটা। নিশ্চিন্ত হয় অরণ্য। নিশ্চয়ই কলির ফোন। কলি ছাড়া সচরাচর তো কেউ মিস কল পাঠায় না। যদিও এখন অভ্যেসটা কমে গেছে, তবু এই সময় অনেকক্ষণ ধরে কথা হয় কলির সঙ্গে। অফিস ফেরত সারা রাস্তা জুড়ে থাকে কলির কথা। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিট। জ্যাম থাকলে আরও দশ পনেরো মিনিট এক্সট্রা। অরণ্যের মোবাইল বিল অফিস পেমেন্ট করে। সুতরাং কলি মিস কল দেয়। রিং ব্যাক করে কথা শুরু করে অরণ্য।

রিং ব্যাক করতে না করতেই ও প্রান্ত থেকে উত্তর ভেসে আসে—স্যার সরি। অনুমিতা বলছিলাম। অসময়ে বিরক্ত করলাম। কলির কোনও খবর পেলেন?

না, বিরক্ত না হলেও অপ্রত্যাশিত অনুর ফোনে খুশি হয় না অরণ্য।

কী ব্যাপার বলুন তো স্যার। সেই সোমবার থেকে কোথাও কোনও খবর না দিয়ে ডুব মেরে বসে আছে। আজ ম্যানেজার সাহেব বলছিলেন, এ মাসে উইদাউট পে করে দেবেন। না জানিয়ে অফিস কামাই করার জন্যে চার্জশিট দেবেন।

এসব আমাকে বলছেন কেন? জানতে চায় অরণ্য। মনে পড়ে এই অনুমিতাই কয়েক ঘণ্টা আগে দুপুরবেলায় একরাশ বিরক্তি উগরে দিয়েছিল। মেয়েদের মর্জি বোঝা সত্যিই কঠিন।

কলির সঙ্গে পরিচয় সেই পঁচানব্বই সাল থেকে। দুর্গাপুর ব্রাঞ্চের কোনও এক বিশ্বনাথবাবুর মেয়ে। কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডে যোগ দিয়েছিল অরণ্যের অফিসে। অরণ্যের সহকারি হয়ে। কাজ শেখার ইচ্ছে আর কাজ করার অদম্য উৎসাহ মুগ্ধ করেছিল অরণ্যকে এবং অন্যান্য সহকর্মীদের। বছর দুয়েকের মধ্যেই ব্রাঞ্চের সব কাজ শিখে পারদর্শিনী হয়েছিল কলি। জিতেছিল ম্যানেজমেন্টের সেরা কর্মচারীর পুরস্কার। গ্রাহক পরিষেবা বন্ধ হওয়ার পরে সহকর্মীরা সেলিব্রেট করেছিল কলির পুরস্কারপ্রাপ্তি। আর কলি নিজের বক্তব্য শোনানোর বদলে কোনও ভূমিকা ছাড়াই সিনিয়র ম্যানেজার, ডেপুটি ম্যানেজারের সামনে সেরা কর্মচারীর লকেটটা ঝুলিয়ে দিয়েছিল অরণ্যের গলায়—এটা আমি আপনাকে উৎসর্গ করলাম। যতটুকু শিখেছি, সব আপনার কাছে। তাই এই পুরস্কারের আসল কৃতিত্ব আপনার। তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি হিংসায় জ্বলত পুরো অফিস। আড়ালে আবডালে অরণ্য আর কলিকে নিয়ে চলত রঙিন গল্প। সেসব খবর কলি জানত। অরণ্য জানত। খাস্তা মুচমুচে সেই সব গল্প আরও মুখরোচক করার জন্য প্রস্তাবটা একদিন কলিই পেড়েছিল অরণ্যের চেম্বারে, চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে—আমি আর আপনি আজ্ঞে, স্যার স্যার করব না। তোমাকে অরণ্যদা, তুমি বলব। আড়ালে এবং প্রকাশ্যে।

প্রস্তাব পেশ করেই সমর্থন চেয়েছিল কলি—তোমার কোনও আপত্তি আছে?

না, কোনও আপত্তি ছিল না অরণ্যের। বরং খুশি হয়েছিল। স্যার কিংবা আপনি সম্বোধনের ভিতর একটা দূরত্ব থাকে। খুব কাছের মানুষকেও মনে হয় যেন দূর সমুদ্রের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। তাছাড়া কলির প্রস্তাবে তো অন্যায় কিছু ছিল না। বিবাহিত অরণ্য তো আর কলির সঙ্গে প্রেমলীলায় মগ্ন হচ্ছে না।

ওদের একে অপরের তুমি সম্বোধন আরও আলোড়িত করেছিল সারা অফিসকে। গুঞ্জনের মাত্রা বাড়তে বাড়তে বন্যার জলের মতো আছড়ে পড়েছিল। কলির মতো সুন্দরী এক বান্ধবী অরণ্যের জীবনকাব্যটাই বদলে দিতে শুরু করেছিল। বাড়িতে সাত বছরের বিবাহিত জীবনে চার বছরের ফুটফুটে রন্টুও কেমন যেন পুরনো পুরনো মনে হত। অফিস কামাই করত না কেউই। কলিও না। অরণ্য না। রবিবার কিংবা ছুটির দিনগুলি ফ্যাকাসে হয়ে যেত অরণ্য কলির জীবনে। কলিগ, সহকর্মীদের আলোচনা আস্তে করে সুইং করে দিতে দ্বিধা করত না। সবার সামনে ট্যাক্সি ছুটিয়ে ছুটির পর বাড়ি ফিরত ওরা।

ঠিক এমনই সময় হঠাৎ একদিন বিয়ে হয়ে গেল কলির। বিয়ে হল অফিসেরই গ্রুপ ডি থেকে সদ্য প্রোমোশন পাওয়া অনীশের সঙ্গে। ফরসা, হ্যান্ডসাম, গিটার

বাজিয়ে গান গাওয়া ছেলের মনে মনে যে কলি ফুটে বসেছিল কেউই জানত না। এমনকি অরণ্যও না। বিয়ের পর মাধবীলতার মতো চঞ্চল হয়ে উঠল কলি। অথচ অনীশ কিছুতেই বের হতে পারছিল না নিজের ডি গ্রুপ গণ্ডী ছেড়ে। হীনম্মন্যতা কাটাতে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণনগর ব্রাঞ্চে বদলি নিয়ে পালাল। বিয়ের পর কলি আর অরণ্যের মেলামেশায় একটু ভাটা পড়লেও ভালোলাগার ফল্গু নদী কখনও জলহীন হয়ে শুকিয়ে যায়নি।

স্যার, মোবাইলের ও প্রান্তে আবার অনুর উদ্বিগ্ন স্বর শোনা যায়। বলুন—ভাবনার ভাঙা বেড়া ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় অরণ্য। কলি খুব ভালো মেয়ে। বনেদি পরিবার। কিন্তু কি যে করল মেয়েটা? শেষ পর্যন্ত একটা পিওন, মানে অনীশকে বিয়ে করল। একবারও ভেবে দেখল না। পেডিগ্রির খবর নিল না। মাকাল রূপ দেখে জমে গেল? অনুর কথায় অরণ্য বুঝতে পারে কলিকে ঘিরে নানান রটনা জড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও সে কলির বান্ধবী। কলিকে ভালোবাসে। কলির ভালো চায়।

কিন্তু আমার তো কিছু করার ছিল না।

নিশ্চয়ই ছিল। আপনি আপত্তি করলে কলি আর একবার ভেবে দেখার সুযোগ পেত—বেশ দৃঢ় স্বরে জানিয়ে দেয় অনুমিতা। তারপর গলা নামায়—টরচার হতে হতে দেখবেন মেয়েটা এদিন পাগল হয়ে যাবে।

টরচার? অবাক হয় অরণ্য। কই কলি তো কোনওদিন কিছু বলেনি। বেশ কয়েকবছর অনীশ আর কলি আলাদা থাকে জানে। রিন্টু থাকে পুরুলিয়ার হস্টেলে। অথচ...।

কেন, আপনি জানেন না? শোনেননি?

কই না তো?

সে কি, আমরা তো জানি আপনি সব জানেন। অনীশ আবার বিয়ে করেছে। কৃষ্ণকলি এক সাঁওতাল মেয়েকে। চাকরি করে কর্পোরেশনের বোরো অফিসে।

ওঃ! অনুর ফোন ঢালা কথা তো নয়, কে যেন হঠাৎ সপাং সপাং চাবুক মারে অরণ্যের বুকের ঠিক মাঝখানে। কলির বিয়ের কিছুদিন পরে ডেপুটি ম্যানেজার হয়ে ভুবনেশ্বরে বদলি হয়ে গেছিল অরণ্য। কলকাতায় এলে কখনও কখনও কথা হত কলির সঙ্গে। ফোনের ভিতর দিয়েই কলির দীর্ঘশ্বাস কানের দরজায় অনুভব করত। আকারে ইঙ্গিতে কী যেন অসহায় অবস্থার কথা বোঝাতে চাইত। কিন্তু অরণ্য বুঝতে পারত না। ছেলেদের এমনই স্বভাব। ঢেলে মেলে বুঝিয়ে না দিলে বুঝতে পারে না। বুঝতে চায় না। দিন বহে যেতে যেতে একসময় যোগাযোগে ভাটা পড়ে। দু-তিন দিনের জন্য অরণ্য যখন কলকাতায় আসে, তখন ব্যস্ততার শেষ থাকে না। সংসার ঘিরে নানান কাজে কলির সঙ্গে দেখা করার সময় পায় না। মনের টান অনুভব

করলেও সময়ের ভাটা উজানে ঠেলে দেয়। ঠেলতে ঠেলতে, ঠেলতে ঠেলতে হারিয়ে যায় কলি। টেলিফোনের যোগাযোগ কমতে কমতে একদিন বিলীন হয়ে যায়।

তারপর অনেক বছর পরে এক ভ্যালেনটাইন ডে-তে আবার হঠাৎ দেখা হয় কলির সঙ্গে। অরণ্য তখন চৌরঙ্গি ব্রাঞ্চের দায়িত্বে। কলি বউবাজারে। অনীশ বাড়ির কাছে বারাসতে। একটা ক্লিয়ারেন্সের গোলমাল মেটাতে কলি এসেছিল চৌরঙ্গি ব্রাঞ্চে। করিডোরে মুখোমুখি।

কলি তুমি? অনেকক্ষণ স্বপ্নের মতো ঘোর জড়িয়েছিল অরণ্যের মনের পরতে পরতে।

তুমি এখানে? কলকাতায়? কবে এলে? আমার নম্বরটাও ভুলে গেছ? একটা ফোন করতে পারোনি? বউদি কেমন আছে? কত বড়ো হয়েছে তোমার ছেলে?

এসো, এসো—অবশ বিবস অবস্থায় কলিকে নিয়ে চেম্বারে ঢুকেছিল অরণ্য। কোনও ভণিতা না করে জিজ্ঞাসা করেছিল—আমাকে তোমার মনে আছে কলি?

অরণ্য, তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না। তবুও শুনে রাখো পৃথিবীর সব কিছু আমি ভুলে গেছি। কেবল তোমাকে ছাড়া।

সত্যি? অবাক হওয়ার চেষ্টা করেছিল অরণ্য। তারপর হঠাৎ কলির ডান হাত নিজের দুই হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরেছিল—কোনও শব্দ না করেই বুঝিয়ে দিয়েছিল যোগাযোগ না থাকলেও কলি তার অন্দরমহলের সিংহাসনে রানির আসনে আসীন হয়ে আছে। তখনও। সেই মুহূর্ত পর্যন্ত।

এককাপ চা খেয়ে কলি সেদিন চলে গেছিল মোবাইল নম্বর ছেড়ে।

রাতেই রিং করেছিল অরণ্য। সাড়ে এগারোটা থেকে ভোর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত। কতদিনের জমানো কথার অঞ্জলি উজাড় করেছিল দু'জনে। তারপর থেকে রোজই কথা হত রাতে। নানান কথা। রবীন্দ্রনাথ থেকে শীর্ষেন্দু। বিলায়েৎ, রবিশঙ্কর থেকে শ্রেয়া ঘোষাল। ঋত্বিক থেকে অনিরুদ্ধ। ফ্রয়েড থেকে বাৎসায়ন। খোলামেলা কথা, মনের যতো অসুখের কথা। শরীরের জ্বরের কথা। রিন্টুকে ঘিরে উদ্বেগের কথা। শুধু অনীশের কথা জানতে চাইলে এড়িয়ে যেত কলি। বলত—থাক না। গোলাপ গাছে গন্ধের বদলে কাঁটা খুঁজে লাভ কী?

সপ্তাহে অন্তত তিনদিন, একসঙ্গে অরণ্যের গাড়িতে বাড়ি ফিরত কলি। পিছনের সিটে হাতের ভাঁজে হাত জড়িয়ে বসে থাকত দু'জনে। মাঝরাস্তায় মোহনকে চা আনতে পাঠিয়ে অরণ্য বলত, এটা অন্যায়। ফাঁকি। একে অপরকে ফাঁকি দেওয়া। যে যার সংসারকে, স্বামী কিংবা স্ত্রীকে ফাঁকি দেওয়া। পরকীয়া।

খিল খিল হাসিতে অরণ্যের কোলের খুব কাছে ছড়িয়ে পড়ত কলি। বলত—তুমি বড্ডো সেকেলে। সেই কলি হঠাৎ কেমন বদলে গেল। অরণ্যের ডাকে অজুহাত খাড়া